প্রশাসনিক উদ্যোগ নেওয়া হলে সেই উদ্ধারকার্য কোন পথে এগোচ্ছে তার পুরো হাল হকিকৎ জেনে একটি মানবিক দিক তুলে ধরা হবে। এই লেখায় সামগ্রীকভাবে অন্য মৎস্যজীবিরা কতখানি নিরাপত্তার অভাববোধ করছেন বা তাদের পরিবারগুলি কতটা ক্ষতিগ্রস্থ বা আতঙ্কিত তার বর্ণনাও অবশ্যই থাকবে।

আরও একটি উদাহরন দেওয়া যায়। যেমন নির্বাচনের সংবাদ পরিবেশনের সময়। কোন নির্বাচনের আগে সংবাদ লিখতে গিয়ে একজন প্রতিবেদক লিখবেন মোট ভোটার সংখ্যা কত, কতজন প্রার্থী আছেন, প্রচার কেমন চলছে এইসব। কিন্তু যিনি ঐ ভোট কেন্দ্রে ঘুরে রাজনৈতিক ফিচার লিখবেন তিনি অবশ্যই ভোটের হাওয়া, ভোটারদের মেজাজ, মনোভাব, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের কর্মতৎপরতা সবকিছু লিখবেন। তিনি আরো জানাবেন এলাকায় ভোট পূর্ববর্তী বিতর্ক। স্থানীয় সমস্যার সঙ্গে কেমনভাবে ভোটের সম্পর্ক জড়িয়ে রয়েছে এবং গোটা এলাকার নির্বাচনী পরিবেশও। অনেক সময় ফিচারে গল্পের ঢঙে বর্ননা তুলে ধরা হয়। সংবাদের সঙ্গে এর মৌলিক পার্থক্য হল সংবাদে খবর লেখা হয় আগে, পরে স্থান পায় বিবরণ ও বর্ণনা। কিন্তু অনেক সময়ই ফিচারে বক্তব্য থাকে শেষে এবং থাকে একঝাঁক প্রশ্ন বা চিন্তার খোরাকও। কে কি ধরনের লেখা লিখবেন সেটা নির্ভর করে তাঁর নিজস্ব লিখনশৈলী, স্টাইল বা ইচ্ছার উপরই। বিচিত্র সব দিক নিয়ে ফিচার লেখা হয়, যেমন মানুষের অভিজ্ঞতা, সাফল্য, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নানা ঘটনা, লেখা যায় প্রতিবন্ধী, ভিক্ষুক, ভবঘুরে, নানা পেশার লোকেদের নিয়ে নানান স্টাইল ও ঢঙে। মোদ্দা কথা হল মানুষকে তথ্য জানানো, বিশ্লেষন নিয়ে ভাবনা চিন্তার রসদ দেওয়া এবং নিছক ও নির্মল আনন্দ দেওয়া। তাই ফিচার লেখায় চিরাচরিত প্রথা বলে কিছু নেই।

ফিচারের প্রধান উপকরণ হচ্ছে মানুষের প্রকৃতি ও পরিবেশ। ফিচার আমাদের মানবিক দিককে উসকে দেয় আমাদের বিভিন্ন ঘটনার অংশীদার করে তোলে। ফিচারের জনপ্রিয়তার মুলই হল সাবলীল ও অননুকরণীয় স্টাইলে লেখা। যা মানুষের মনে ভালো লাগার নব দিগন্ত খুলে দেয়। তাই ফিচার নিয়ে নানা গবেষণা চলছে নিরন্তর ভাবে। তা যত চলবে তত বাড়বে এর জনপ্রিয়তা ও আবেদন।

কলাম বা স্তম্ভ

কলাম বা স্তম্ভ আজকাল খবরের কাগজের অন্যতম এক উপাদান। কলাম একদিকে যেমন আকর্ষনীয় তেমনি তা তথ্য জ্ঞাপকও। বহু বিশিষ্ট সাংবাদিকরা যেমন কলাম লেখেন তেমনি অন্যান্য বহু ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও কলাম লেখেন বিভিন্ন সংবাদপত্রে। আবার কলাম লেখক বা বিশিষ্ট কলমচিরা অনেক সময় একাধিক সংবাদপত্রে কলাম লেখেন বিভিন্ন ভাষায় যেগুলি ছাপা হয় এগুলিকে সিন্ডিকেট কলাম বলে। কলাম বা স্তম্ভ বলতে সাধারণতঃ খবরের কাগজের একটি কলাম বা স্তম্ভের পরিমান অর্থাৎ গতানুগতিক আটশো থেকে হাজার শব্দের মধ্যে এমনি লেখা বলে মনে করা হয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই

লেখার পরিসর গোটা স্তম্ভ দখল করে না। অনেক স্তম্ভকার গড়ে দৈনিক আটশো বা ততোধিক শব্দে তাঁদের কলাম লেখেন। অনেকে আবার পাঁচশো শব্দেই তাদের কলাম লিখতে পারেন। যা তারা পরিবেশন করেন স্বল্প কথায়, আকর্ষনীয় ঢঙে। পরলোকগত উইল রজার্স তাঁর বিখ্যাত কলাম লিখতেন গড়ে মাত্র একটি অনুচ্ছেদে।

আমরা অজ্ঞাত কুলশীলকে নয় ব্যক্তিকে পছন্দ করি। তাই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কলাম লেখার প্রতি এত আগ্রহ মানুষের। তা লেখার বৈশিষ্ট্য ও উপস্থাপনার জন্যও যেমন বটে তেমনি তা বিশেষজ্ঞ কলম লিখিয়েদের চিন্তাপূর্ণ মতামত ও বিশ্লেষণের জন্যও। কিন্তু অতীত দিনের সংবাদপত্রে বিভিন্ন লেখা প্রকাশিত হত লেখকদের নাম পরিচয় ছাড়াই। ফলে পাঠকেরা সেইসব লেখাগুলিকে দায়সারা ও প্রাণের উত্তাপবিহীন লেখা বলেই মনে করতেন। কোন আলাদা আকর্ষণ বা প্রাণের তাগিদ অনুভব করতেন না। পরবর্তীকালে যখন পাঠককুল কলাম বা স্তম্ভ পড়ার স্বাদ পেতে শুরু করেন এবং বিশেষ ধরনের মতামত বা মুডের উপর লেখা পড়তে শুরু করলেন বিশিষ্ট কলামনিষ্টদের কলমের আঁচড়ে তার সাথেই তারা একাত্ম হতে শুরু করলেন। জনপ্রিয়তাও বাড়তে লাগল এ ধরনের লেখার। তাই কলাম বা স্তম্ভ লেখার সূত্রপাত সাংবাদিকতার সূচনা পর্বে নয়। তা এসেছে অনেক পরে। এটা পপুলার সাংবাদিকতারই একটি অঙ্গ। কলাম বা স্তম্ভ লেখকদের জনপ্রিয়তার সবচেয়ে বড় কারণ হল তাদের স্বাধীন মতামত এবং নির্ভীকতার জন্য। কলাম বা স্তম্ভ হিসাবে যেসব লেখা সাধারণতঃ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় তার মতামত ও বিশ্লেষণের দায়িত্বও সম্পূর্ণই লেখকের। কাগজের সম্পাদকেরা এই সব লেখার জন্য দায়িত্বশীল থাকেন না। তার ফলে পাঠক যে কোন বিষয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে দুই ধরনের লেখাই কলাম বা স্তম্ভে পেয়ে যান। যে কোন বিষয়ের বিচার করতে বা তুল্যমূল্য খতিয়ে দেখতে যা পাঠকদের সাহায্য করে। এই ধরনের লেখায় সম্পাদকীয় বিভাগের নিয়ন্ত্রণও অনেক কম থাকে বলে পাঠক খোলামেলা লেখা পড়তে পারেন। অনেক কাগজই সরকারের নানা নীতিসমূহ বা কাজকর্মের পক্ষে ও বিপক্ষে দুরকম লেখাই স্তম্ভকার বা কলমচিদের দিয়ে লেখায়। সব ধরনের পাঠকদের খুশি রাখার জন্যই এটা করানো হয়। তেমনই সামাজিক অবস্থা ও রীতিনীতি, সরকারি পদক্ষেপ, রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসনিক কাজকর্ম, পরিকল্পনা এমনকি নানারকম সমালোচনামূলক ও গ্রাম্য হাস্যরসাত্মক কলামও আজকাল পাঠকদের মনে দাগ কাটতে সক্ষম হয়েছে। সাংবাদিকতার স্পেশালাইজেশন যত বেড়েছে ততই বিশেষজ্ঞদের নিয়ে নানারকম পরীক্ষামূলক ও বিশ্লেষণমূলক লেখার জনপ্রিয়তা বেড়েছে। বেড়েছে চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তাও। এক এক ধরনের পাঠকদের আগ্রহ ও ভালালাগা এক এক ধরনের স্তম্ভকারের লেখার প্রতি নিবদ্ধ হয় ফলে সপ্তাহ ধরে পাঠক তার প্রিয় কলামনিষ্ট বা স্তম্ভকারের পরবর্তী লেখাটির জন্য অপেক্ষা করেন। লেখার ব্যাপারে স্তম্ভকার ভোগ করেন সর্বাধিক স্বাধীনতা এটাই সত্য। শুধু কুৎসা, আইন বা আচরনবিধি লঙ্ঘন বা অশ্লীল কিছু সেসব লেখায় না থাকলেই হল। এমনকি যে কাগজে তিনি লেখেন সেই

কাগজের সম্পাদকীয় অভিমতের বিরোধী মতামতও কোন স্তম্ভকার তার কলমে লিখতেই পারেন। যুক্তির অবতারণা করে তিনি সেই লেখাকে অকাট্য প্রতিপন্ন করতে পারেন। আসলে আজকাল দেখা যায় বড় বড় কাগজগুলি কোন কোন সময় এমন সব স্তম্ভকারের লেখা ছাপায় যাঁর মতামমতের সঙ্গে পত্রিকার নীতি পরস্পর বিরোধী। একাজটি করে কাগজ সূক্ষ রাজনীতি ও কুটনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই। কারণ যখনই পাঠক দেখেন পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলী কোন বিষয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে দুই ধরনের মতামতই প্রকাশের ব্যাপারে স্তম্ভকারদের স্বাধীনতা দেয় তখন তারা ধরে নেন যে পত্রিকাটি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে উদার ও নিরপেক্ষ। তবে এমন সুখকর পরিস্থিতি ও উদার নিরপেক্ষ মনোভাব কিন্তু আগে ছিল না। এটা বর্তমানের সাংবাদিকতার নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা ও গবেষনার ফল। প্রধানতঃ প্রখ্যাত স্তম্ভকার হেইউড ব্রাউনের প্রয়াসের ফলশ্রুতি হিসাবেই ১৯২০ সালের পর থেকে এই পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটে। ব্রাউন মনে করতেন সংবাদপত্র জনসেবায় নিয়োজিত একটি প্রতিষ্ঠান যার কাজ হল অবিচার ও নাগরিক অধিকার সুরক্ষার জন্য লড়াইয়ে অংশ নেওয়া, মত প্রকাশের স্বাধীনতা স্বীকার করা ও জনমত গঠনে সাহায্য করা। তিনি এই নীতি মানতে গিয়ে অনেক বাধা পেয়েছেন। প্রতিবাদী হয়েছেন ফলে তাঁর লেখা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তবু তিনি আপোষহীন ভাবে লড়াই করেছেন কিন্তু তার পথ থেকে কখনও সরে আসেননি।

হেইউড ব্রাউনের পর থেকে অন্যান্য আরও নানা স্তম্ভকার অনুভব করেন স্তম্ভ লেখার ব্যাপারে স্বাধীনতা থাকাটা অত্যন্ত জরুরি। তাঁরাও সম্পাদকীয় নিয়ন্ত্রন ও নানা বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে শুরু করেন। একই সময়ে বিভিন্ন বড় সংবাদপত্রের সম্পাদক ও পরিচালকবর্গও উপলব্ধি করেন যে বিভিন্নমুখী ধ্যানধারনা ও মতামতের স্বাধীনতার একটা আলাদা বাজার ও মূল্য রয়েছে। বিশেষ করে কাগজের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার এটা একটা বড় দিক। আমলে স্তম্ভকাররা যখন সত্যিই সম্পাদকীয় মতামতের থেকে ভিন্নমত পোষন ও তা প্রকাশ করতে শুরু করলেন তখন সম্পাদক ও পরিচালকরাও লক্ষ্য করতে শুরু করলেন এর ফলে মহাভারত অশুদ্ধ তো হলই না বরং পাঠকদের কিছুটা খোলা হাওয়ার আস্বাদও পৌঁছে দেওয়া গেল। আর এতে কাগজের নিরপেক্ষতা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গীও পাঠকেরা গ্রহণ করলেন বেশ ভালোভাবেই। সেই কারনেই স্তম্ভকারদের স্বাধীনতা স্বীকৃত হল তাদের কাছে। স্তম্ভকাররাও একইভাবে সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ধীরে ধীরে তাদের জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে তুললেন। একই সঙ্গে বাড়ল কলাম বা স্তম্ভের জনপ্রিয়তাও। যা আজ আমাদের দেশে সীমাহীন। বহু কাগজেই আজ কলামের চাহিদা ভীষণভাবে বেড়ে গেছে। স্থায়ী কলাম লেখকদের পাশাপাশি কাগজগুলি আজকাল ছাপাচ্ছে সিন্ডিকেট কলামনিষ্টদের লেখাও। বহু বিখ্যাত সাংবাদিকরাই লিখছেন এই ধরনের কলাম। এক সময় আনন্দবাজার পত্রিকায় কুলদীপ নায়ার, রনজিত রায় ও বরুন সেনগুপ্তের কলাম ছিল বিখ্যাত। যুগান্তরে শ্রী নিরপেক্ষ এবং দ্য টেলিগ্রাফে নিখিল চক্রবর্তী, এম জে আকবর এবং

ধীর সাংভির কলাম ছিল ভীষনই আকর্ষনীয়। বর্তমানে হলধর পটলের ময়নাতদন্ত অনেকেই পড়েছেন। এখনও আজকালে অশোক দাশগুপ্তের নেপথ্য ভাষণ এবং একদিনে সুমন চট্টোপাধ্যায়ের সহজপাঠ জনপ্রিয় কলাম। আনন্দবাজার পত্রিকায় সপ্তাহে প্রতিদিন বহু আকর্ষনীয় কলাম লেখেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখকরা। অতীতে এক সময় প্রখ্যাত সাংবাদিক খুশবন্ত সিংয়ের 'গসিপ সুইট অ্যান্ড সাওয়ার' দারুণ জনপ্রিয় ছিল। প্রতিদিন কাগজে শ্রী নিরপেক্ষর উহ্যবার্তা, হিন্দুস্থান টাইমস সংবাদপত্রে বরখা দত্তের থার্ড আই জনপ্রিয় কলাম। নিজ নিজ কাগজে এক সময় কলাম লিখতেন প্রয়াত সি আর ইরানী (স্টেটসম্যান) এবং এন রাম (হিন্দু)। তেমনি হাস্যরসাত্মক কলাম হিসাবে আনন্দবাজারে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'রসেবশে' কলাম দারুন জনপ্রিয় ছিল।

ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকার

বক্তার বক্তব্যই খবর। প্রতিদিনের সংবাদপত্রে প্রতিবেদক ও বিশেষ প্রতিনিধিরা বিভিন্ন ধরনের বক্তার সংস্পর্শে আসেন। কখনও বক্তারা নিজে থেকেই বক্তব্য রাখেন আবার কখনও তাঁদের কাছে থেকে প্রশ্ন করে জিজ্ঞাস্য বিষয় সম্বন্ধে জেনে নিতে হয়। এই জিজ্ঞাসাই সাক্ষাৎকার বা ইন্টারভিউ। ইন্টারভিউ করা খুব সহজ বা সাধারণ ব্যাপার নয় কেননা ইন্টারভিউ ঠিকমত নেওয়াটা অবশ্যই একটা আর্ট বা শিল্প। এই সাক্ষাৎকার গ্রহণ পদ্ধতি বা ইন্টারভিউ টেকনিক যত ভালো হবে ততবেশি সাক্ষাৎকার হয়ে উঠবে মনোগ্রাহী ও জমজমাট। আর এমনটিই তো পাঠক পাঠিকা বা শ্রোতা ও দর্শকরা চান।

সত্যিকার সাক্ষাৎকার বলতে যা বোঝায় তা বছরের পর বছর ধরে সাংবাদিকতার একটা আলাদা শিল্প আঙ্গিক হিসেবে গড়ে উঠেছে। সাক্ষাৎকারের প্রথম বিকাশ এদেশে নয় বিদেশে। মার্কিন সংবাদপত্রে প্রথম সাক্ষাৎকার ছাপা হয় নিউইয়র্ক ট্রিবিউন পত্রিকায়। সাংবাদিক হোরেস গ্রিলি মার্কিন নেতা ব্রিগহ্যাম ইয়ং এর সাক্ষাৎকার নেন। মার্কিন দাসপ্রথা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ ইত্যাদি সমস্যার সরাসরি প্রশ্নোত্তর পর্বটি সেই সময় যেমন সাংবাদিকতার উপজীব্য হয়ে ওঠে তেমনি পাঠকদের মন জয় করে নেয়। গ্রিলি ঐ সাক্ষাৎকার প্রশ্নোত্তর আকারেই সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন। সংবাদপত্রে ফিচার হিসেবে এবং প্রতিবেদন হিসাবে সাক্ষাৎকারের বিকাশ ঘটিয়েছেন জেমস গর্ডন বেনেট। তার লেখা সাক্ষাৎকার ভিত্তিক এই সব প্রতিবেদন নিউইয়র্ক হেরাল্ড পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আধুনিক সাংবাদিকতায় সাক্ষাৎকার বলে আমরা যাকে চিহ্নিত করি তা হচ্ছে দুই ব্যক্তির সরাসরি কথাবার্তা, ভাব বিনিময় এবং যোগাযোগের ফসল। এই দুই ব্যক্তির একজন প্রতিবেদক ও অন্যজন সাক্ষাৎকার দাতা। সাক্ষাৎকারে প্রতিবেদকের সরাসরি জিজ্ঞাসা ও প্রশ্নোত্তরের জবাবে সাক্ষাৎকারদাতা তার মন ও মানসিকতার পর্দা ওঠান। ফলে জনগন তা জানতে পারেন।

আজকাল সংবাদপত্র ও সংবাদ মাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিনের দিন ভীষণ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। সম্পাদকরা আজকাল সাক্ষাৎকারকেই সংবাদের প্রধান উপাদান হিসাবে গ্রহণ